بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৪৭। www.motaher21.net

أَكْرَمَكُمْ

" সম্মানীয়। "

" Respected."

সুরা: আল-হুজুরাত

আয়াত নং :-13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

তাফসীর :

আল্লাহর এ বাণীটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যেমন-মক্কা বিজয়ের সময় কাবার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেনঃ “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু’ ভাগে বিভক্ত। এক, নেককার ও পরহেজগার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।” (তিরমিযী: ৩১৯৩]

অনুরূপভাবে, বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, "হে লোকজন! সাবধান তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি? তারা বলল, আল্লাহর রাসূল পৌঁছিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেয়।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৪১১]

অন্য হাদীসে এসেছে, "তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নাক দিয়ে পায়খানা ঠেলে এমন নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।" [মুসনাদে বায্যার: ৩৫৮৪]

আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী"। [ইবনে জারীর: ৩১৭৭২] আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন ।" [মুসলিম: ২৫৬৪, ইবনে মাজাহ: ৪১৪৩]

কোন কোন মুফাসসিরের মতে, বড় বড় গোত্রকে شعون আর তার চেয়ে ছোট গোত্রকে قبائل বলা হয়। অপর কারও মতে, অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় যেহেতু সংরক্ষিত নেই সেহেতু তাদেরকে شعون বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে قبائل বলা হয়। [দেখুন-কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন অকল্যাণ ও অনাচার থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব পথনির্দেশের প্রয়োজন ছিল পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে সেসব পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। এখন এ আয়াতে গোটা মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে একটি বিরাট গোমরাহীর সংশোধন করা হচ্ছে যা আবহমান কাল ধরে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ এবং জাতীয়তার গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা। প্রাচীনতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানুষ সাধারণত মানবতাকে উপেক্ষা করে তাদের চারপাশে কিছু ছোট ছোট বৃত্ত টেনেছে। এ বৃত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণকারীদের সে তার আপন জন এবং বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের পর বলে মনে করেছে। কোন যৌক্তিক বা নৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে এ বৃত্ত টানা হয়নি বরং টানা হয়েছে জন্মের ভিত্তিতে যা একটি অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার মাত্র। কোথাও এর ভিত্তি একই খান্দান, গোত্র ও গোষ্ঠিতে জন্মগ্রহণ করা এবং কোথাও একই ভৌগলিক এলাকায় কিংবা এক বিশেষ বর্ণ অথবা একটি বিশেষ ভাষাভাষী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা। তাছাড়া এসব ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আপন

ও পরের বিভেদ রেখা টানা হয়েছে। এ মানদণ্ডে যাদেরকে আপন বলে মনে করা হয়েছে পরদের তুলনায় তাদের কেবল অধিক ভালবাসা বা সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এ বিভেদনীতি ঘৃণা, শত্রুতা, তাচ্ছিল্য ও অবমাননা এবং জুলুম ও নির্যাতনের জঘন্যতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর সমর্থনে দর্শন রচনা করা হয়েছে। মত ও বিশ্বাস আবিষ্কার করা হয়েছে। আইন তৈরী করা হয়েছে। নৈতিক নীতিমালা রচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র এটিকে তাদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে গ্রহণ করে বাস্তবে অনুসরণ করেছে। এর ভিত্তিতেই ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি বলে মনে করেছে এবং তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধানে পর্যন্ত অইসরাঈলীদের অধিকার ও মর্যাদা ইসরাঈলীদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রেখেছে। এ ভেদনীতিই হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের জন্ম দিয়েছে যার ভিত্তিতে ব্রাহ্মনদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উচ্চ বর্ণের লোকদের তুলনায় সমস্ত মানুষকে নীচ ও অপবিত্র ঠাওরানো হয়েছে এবং শুদ্রদের চরম লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্য টেনে আফ্রিকা ও আমেরিকায় কৃষ্ণাংগদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই বরং আজ এ শতাব্দীতেই প্রতিটি মানুষ তার নিজ চোখে দেখতে পারে। ইউরোপের মানুষ আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড ইণ্ডিয়ান জাতি গোষ্ঠির সাথে যে আচরণ করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জাতিসমূহের ওপর আধিপত্য কায়েম করে তাদের সাথে যে ব্যবহার করেছে তার গভীরেও এ ধ্যান-ধারণাই কার্যকর ছিল যে, নিজের দেশ ও জাতির গণ্ডির বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের জান-মাল ও সম্ভ্রম নষ্ট করা তাদের জন্য বৈধ। তাদেরকে লুট করা, ক্রীতদাস বানানো এবং প্রয়োজনে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকার তাদের আছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জাতিপূজা এক জাতিকে অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য যেভাবে পশুতে পরিণত করেছে তার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে সংঘটিত যুদ্ধসমূহেই দেখা গিয়েছে এবং আজও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে নাৎসী জার্মানদের গোষ্ঠী দর্শন ও নরডিক প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিগত মহাযুদ্ধে যে ভয়াবহ ফল দেখিয়েছে তা স্মরণ রাখলে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, তা কত বড় এবং ধ্বংসাত্মক গোমরাহী। এ গোমারাহীর সংশোধনের জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে।এ ছোট্ট আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেনঃএকঃ তোমাদের সবার মূল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র নারী থেকে তোমাদের গোটা জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে তোমাদের যত বংশধারা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে তা একটি মাত্র প্রাথমিক বংশধারার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যা একজন মা ও একজন বাপ থেকে শুরু হয়েছিল। এ সৃষ্টি ধারার মধ্যে কোথাও এ বিভেদ এবং উচ্চ নীচের কোন ভিত্তি বর্তমান নেই। অথচ তোমরা এ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত আছো। একই আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা। এমন নয় যে, বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন খোদা সৃষ্টি করেছেন। একই সৃষ্টি উপকরণ দ্বারা তোমরা সৃষ্টি হয়েছো। এমন নয় যে, কিছু সংখ্যক মানুষ কোন পবিত্র বা মূল্যবান উপাদানে সৃষ্টি হয়েছে এবং অপর কিছু সংখ্যক কোন অপবিত্র বা নিকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। একই নিয়মে তোমরা জন্মলাভ করেছো। এমনও নয় যে, বিভিন্ন মানুষের জন্মলাভের নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া তোমরা একই পিতা-মাতার সন্তান। এমনটিও নয় যে, সৃষ্টির প্রথম দিককার মানব দম্পতির সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আলাদা আলাদা জন্মলাভ করেছে।দুইঃ মূল উৎসের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভিক্ত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। একথা স্পষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বে গোটা মানব সমাজের একটি মাত্র বংশধারা আদৌ হতে পারতো না। বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন খান্দান ও বংশধারার সৃষ্টি হওয়া এবং তারপর খান্দানের সমন্বয়ে গোত্র ও জাতিসমূহের পত্তন হওয়া অপরিহার্য ছিল। অনুরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর বর্ণ, দেহাকৃতি, ভাষা এবং জীবন যাপন রীতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। একই ভূখণ্ডের বসবাসকারীরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং দূর-দূরান্তের ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান সৃষ্টি

হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতিগত এ পার্থক্য ও ভিন্নতার দাবী এ নয় যে, এর ভিত্তিতে উচ্চ ও নীচ, ইতর ও ভদ্র এবং শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হওয়ার ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে, একটি বংশধারা আরেকটি বংশধারার ওপর কৌলিন্যের দাবী করবে, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোকদের হেয় ও নীচ মনে করবে, এক জাতি অন্য জাতির ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য কায়েম করবে এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক জাতি অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। যে কারণে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানব গোষ্ঠীসমূহকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের আকারে বিন্যস্ত করেছিলেন তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানা শোনা ও সহযোগিতার জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক উপায়। এ পদ্ধতিতে একটি পরিবার, একটি প্রজাতি, একটি গোত্র এবং একটি জাতির লোক মিলে একটি সম্মিলিত সমাজ গড়তে এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি প্রকৃতি যে জিনিসকে পারস্পরিক পরিচয়ের উপায়ে বানিয়েছিল শুধু শয়তানী মূঢ়তা ও মূর্খতা সে জিনিসকে গর্ব ও ঘৃণার উপকরণ বানিয়ে নিয়েছে এবং বিষয়টিকে অত্যাচার ও সীমালংঘনের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে।তিনঃ মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ যদি কিছু থেকে থাকে এবং হতে পারে তাহলে তা হচ্ছে নৈতিক মর্যাদা। জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষ সমান। কেননা, তাদের সৃষ্টিকর্তা এক, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও এক এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতা-মাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাছাড়া কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ দেশ, জাতি অথবা জাতি-গোষ্ঠীতে জন্মলাভ করা একটি কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র। এতে তার ইচ্ছা, পছন্দ বা চেষ্টা-সাধনার কোন দখল নেই। একদিক দিয়ে কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মর্যাদালাভের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যে মূল জিনিসের ভিত্তিতে এক ব্যক্তি অপর সব ব্যক্তিদের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা হচ্ছে, সে অন্য সবার তুলনায় অধিক আল্লাহ ভীরু মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পবিত্রতার পথ অনুগমনকারী। এরূপ ব্যক্তি যে কোন বংশ, যে কোন জাতি এবং যে কোন দেশেরই হোক না কেন সে তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। যার অবস্থা এর বিপরীত সর্বাবস্থাই সে একজন নিকৃষ্টতর মানুষ। সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ হোক এবং প্রাচ্যে জন্মলাভ করে থাকুক বা পাশ্চাত্যে তাতে কিছু এসে যায় না।এ সত্য কথাগুলোই যা কুরআনের একটি ছোট্ট আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে-রসূলুল্লাহ ﷺ তা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেনঃ

الحمد لله الذى اذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها – يا ايها الناس , الناس رجلا , برتقى كريم على الله , وفاجر شقى هين على الله – الناس كلهم بنو ادم وخلق الله ادم من تراب- (بيهقى فى شعب الايمان – ترمذى)

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। এক, নেককার ও পরহেজগার---যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দূরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায়, সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।" (বায়হাকী--ফী শুআবিল ঈমান, তিরমিযী) বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী (সা.) বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ - لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لاَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ولا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ –الا هل بلغتُ؟ قَالُوا بَلَى يا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فليُبَلِّغِ اشَّاهِدُ الْغَائِبَ(بيهقى)

“হে লোকজন! সাবধান! তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের, কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সবাই বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেয়।” (বায়হাকী) একটি হাদীসে নবী (সা.) বলেছেনঃ

كلكم بنو ادم وادم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بأبائهم او ليكونن اهون على الله من الجعلان – (بزار)

“তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।” (বাযযার) আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেনঃ

ان الله لايسئلكم عن احسابكم ولاعن انسابكم يوم القيامة ان اكرمكم عند الله اتقكم – (ابن جرير)

“আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।” (ইবনে জারীর) আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ(مسلم , ابن ماجه)

“আল্লাহ তা’আলা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।” (মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) এসব শিক্ষা কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সে শিক্ষা অনুসারে ইসলাম ঈমানদারদের একটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছে। যেখানে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কোন ভেদাভেদ নেই, যেখানে উচ্চ নীচ, ছুত-ছাত এবং বিভেদ ও পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই এবং যে কোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশেরই হোক না কেন সেখানে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে শরীক হতে পারে এবং হয়েছে। ইসলামের বিরোধীদেরও একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের নীতিমালাকে মুসলিম সমাজে যেভাবে সফলতার সাথে বাস্তব রূপদান করা হয়েছে বিশ্বের আর কোন ধর্ম ও আদর্শে কখনো তার কোন নজির পরিলক্ষিত হয়নি। একমাত্র ইসলাম সেই আদর্শ যা বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলে ও আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীকে মিলিয়ে একটি জাতি বানিয়ে দিয়েছে। এ পর্যায়ে একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করাও অত্যন্ত জরুরী। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে ইসলামী আইন ‘কুফু’ বা ‘সমবংশ’ হওয়ার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করে, কিছু লোক তার অর্থ গ্রহণ করে এই যে, কিছুসংখ্যক জ্ঞাতি গোষ্ঠী আছে কুলীন ও অভিজাত এবং কিছু সংখ্যক ইতর ও নীচ। তাদের পরস্পরের মধ্যে

বৈবাহিক সম্পর্ক আপত্তিজনক। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইসলামী আইন অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের প্রত্যেক মুসলমান নারীর সাথে বিয়ে হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবনের সফলতা স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাস, আচার-আচরণ, জীবন-যাপন পদ্ধতি, পারিবারিক ও বংশগত ঐতিহ্য এবং আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভর করে যাতে তারা পরস্পরের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। 'কুফু' বা সমবংশ হওয়ার মূল লক্ষ্য এটিই। যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক দিয়ে অনেক বেশী দূরত্ব হবে সেখানে জীবনব্যাপী বিস্তৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বনিবনার আশা কমই করা যায়। তাই ইসলামী আইন এ রকম দাম্পত্য বন্ধনকে পছন্দ করে না। এখানে আশরাফ ও আতরাফের কোন প্রশ্নই নেই। বরং উভয়ের অবস্থার মধ্যে যদি স্পষ্ট পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কে গুণাবলীর দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ আর কে নীচু মর্যাদার মানুষ তা আল্লাহই ভাল জানেন। মানুষ নিজেরা নিজেদের উচ্চ নীচের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে দুনিয়াতে যাকে অনেক উচ্চ মর্যাদার মানুষ মনে করা হতো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালায় সে অতি নীচুস্তরের মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং যাকে এখানে অতি নগণ্য মনে করা হয়েছে সেখানে সে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আসল গুরুত্ব দুনিয়ার সম্মান ও লাঞ্ছনার নয়, বরং কেউ আল্লাহর কাছে যে সম্মান ও লাঞ্ছনা লাভ করবে তার। তাই যেসব গুণাবলী আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের উপযুক্ত বানাতে পারে নিজের মধ্যে সেসব বাস্তব গুণাবলী সৃষ্টির জন্য মানুষের সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

এতক্ষণ সামাজিক বিধি-বিধান আলোচনা করার পর আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টির সূচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমরা একজন মাত্র নর-নারী তথা আদম ও হাওয়া (আঃ) থেকে সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মানুকে চারটি পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। (১) কোন নারী-পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, যেমন আদম (আঃ)। (২) পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন নারী ছাড়া, যেমন হাওয়া (আঃ), (৩) নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন কোন পুরুষ ছাড়াই, যেমন ঈসা (আঃ), (৪) নারী-পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন যেমন সকল মানুষ।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করার পর বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন যাতে একে অপরকে চিনতে পারে। যেমন সে অমুকের ছেলে, সে অমুক গোত্রের লোক ইত্যাদি। এ জন্য বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেন যে, অমুক গোত্র অমুক গোত্র থেকে, অমুক জাতি অমুক জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ। আর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি একটিই, তা হলো তাকওয়া। সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ হোক, আরবি হোক আর অনারবি হোক, প্রাচুর্যশালী হোক আর নিঃস্ব হোক।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশি আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করেছে সে বেশি সম্মানিত.....। (সহীহ বুখারী হা. ৩৩৮৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَي صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَي قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখবেন। (সহীহ মুসলিম হা. ২৫৬৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে বলেছেন : তাকওয়া ব্যতীত অন্য কোন কিছুর কারণে আরবের ওপর কোন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- অধ্যায় : বিদায় হাজ্জ)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. মানব জাতির উৎস আদম ও হাওয়া (আঃ)।

২. মানব জাতিকে বিভিন্ন গোত্রে ও জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে পরস্পরে পরিচয় লাভের জন্য ।

৩. শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি একমাত্র তাকওয়া। গোত্র, জাতি বা দেশ নয়।